The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 17, No. 33-34, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098, e-ISSN 2408-851X
DOI : http://dx.doi.org/10.70438/dujl/173334/0002

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই

হাকিম আরিফ*

Abstract: This paper describes the overall linguistic contributions of Muhammad Abdul Hai, a leading linguist based in Dhaka, who made significant contributions after 1947. Using content analysis within a qualitative framework, this paper investigates his five renowned books on linguistics, including *A Phonetic and Phonological Study of Nasals and Nasalisation in Bengali* (1960), to interpret Hai's perspective on the structural linguistic approach that laid the groundwork for modern linguistic studies in Dhaka. It firmly states that in this region, Abdul Hai not only pioneered research on the underlying phonological structures of Bangla, including the characteristics of nasals and nasalisation, but also contributed significantly to its sociolinguistic perspective. This paper concludes that linguistic study and research in Dhaka are now progressing along the traditions and directions initiated by Muhammad Abdul Hai.

Keywords: Muhammad Abdul Hai, Structural linguistics, phonetics, phonology, student-friendly grammar

শুরুতেই বলে নেওয়া ভাল, এই প্রবন্ধের[১] শিরোনাম 'সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই' এর পরিবর্তে 'আচার্য ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই' হতে পারতো এবং তা খুব যৌক্তিকও বটে। কারণ বাংলাদেশে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার আরেক দিকপাল হুমায়ুন আজাদ আবদুল হাইকে 'আচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেছেন (আজাদ ১৪০০)। অধ্যাপক আজাদের মত খুঁতখুঁতে ও প্রশংসা-কার্পণ্য ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে 'আচার্য' তকমা লাভ করা শিক্ষক হিসেবে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের জন্য নিঃসন্দেহে শ্লাঘার বিষয়। হুমায়ুন আজাদ "আচার্য মুহম্মদ আবদুল হাই" (১৪০০) প্রবন্ধে নিজের শিক্ষক আবদুল হাইকে শিক্ষকতা ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর গভীর অভিনিবেশ এবং তীক্ষ্ণ মনীষা অর্জনের জন্য সামগ্রিক অবদান হিসেবে এই 'আচার্য' অভিধাটি প্রদান করেছেন। তাঁরই ভাষ্যে বলা যেতে পারে, "অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের নামের সাথে মনীষী বা আচার্য অভিধা ব্যবহার রীতি হয়ে ওঠে নি, যদিও আজকাল নিয়মিত অপব্যবহার করছি আমরা এসব অভিধা" (১৪০০: ১০)। এটি মূলত ভাষাবিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য এবং পারদর্শিতাকেই নির্দেশ করতেই ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত

* অধ্যাপক, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাতচল্লিশ-উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক একাডেমিক ভাষাবিজ্ঞানচর্চায় কিভাবে মুহম্মদ আবদুল হাই প্রকৃত অর্থেই একজন আচার্য হয়ে উঠেছেন তা-ই বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য, এই প্রবন্ধে ভাষাবিজ্ঞানচর্চায় আবদুল হাইয়ের কৃতিত্বকে মূলত তার রচিত *A Phonetic and Phonological Study of Nasals and Nasalisation in Bengali* (1960) *ধ্বনিবিজ্ঞান এবং বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব* (১৯৬৪), *রাজনীতি ও তোষামোদের ভাষা*(১৯৫৯), *প্রাথমিক বাংলা ব্যাকরণ* ইত্যাদি গ্রন্থের আলোকে বিশ্লেষণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

প্রবন্ধের মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ভাষাবিজ্ঞানী তথা ধ্বনিবিজ্ঞানী হয়ে ওঠার পটভূমিটি বিবেচনা করা যেতে পারে। ১৯১৯ সালের ২৬শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার রাণীনগর থানার মরিচা গ্রামে জন্মগ্রহণকারী আবদুল হাই কোনদিন ভাষাবিজ্ঞান তথা ধ্বনিবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা লাভ করবেন সে কথা ভাবেননি কখনও। তিনি *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা* গ্রন্থের "ধ্বনির ব্যবহার" প্রবন্ধে তারই স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে, "ভবিষ্যৎ জীবন আমার কিভাবে যে গড়ে উঠবে তা কখনও ভাবিওনি। ধ্বনিবিজ্ঞানে যে একদিন দীক্ষা নেবো, এমন কথা ঘুণাক্ষরেও মনে পড়েনি" (১৯৯৪: ২৯০)। কারণ ভাষাবিজ্ঞান বা ধ্বনিবিজ্ঞান তখনও একটি প্রয়োজনীয় চাকরিনির্ভর শাস্ত্র হিসেবে ভারতীয় একাডেমিয়াতে বিকশিত হয়ে উঠেনি; সেটি এখনও সমানভাবে প্রযোজ্য। যাই হোক, ঘটনাচক্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়ে অধ্যয়নের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদানের সূত্র ধরেই ভাষাতত্ত্ব বা ভাষাবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার এই সুযোগ তার জন্য তৈরি হয়। এই বিষয়টি এখনও বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

এক্ষেত্রে আরেকটি পটভূমি বিবেচনাযোগ্য। মুহম্মদ আবদুল হাই ভাষাতত্ত্বে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যাওয়ার সুযোগ পেলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, ভাষাতত্ত্বের কোন বিশেষায়িত ক্ষেত্রটিকে তিনি অধ্যয়নের জন্য বেছে নিবেন? আমাদের মনে রাখা উচিত যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর হাত ধরে তাঁর ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিভূমিটি তৈরি হয়। কিন্তু ওস্তাদের হাতে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পদ্ধতি অধ্যয়ন করে উপলব্ধি করতে পারেন যে, ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান ধারাটি খুবই পুরনো এবং সেকেলে হয়ে গিয়েছে। কারণ ততদিনে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ভাষা গবেষণা ঐতিহাসিকতার খোলস ছেড়ে সাংগঠনিক ধারার কল্যাণে অনেক বেশি বিজ্ঞানমুখী হয়ে উঠেছে এবং এই শাস্ত্রটি নিজের নামের সাথে 'বিজ্ঞান' অভিধা যুক্ত করে হয়ে উঠেছে 'ভাষাবিজ্ঞান'। এই বিষয়টি মুহম্মদ আবদুল হাই সম্যক অবহিত হন। তাই বুঝতে পারেন, শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত ভাষাতত্ত্বের তত্ত্ব ও পদ্ধতি দিয়ে ভাষার ভেতরকার সংগঠনসূত্রটি উন্মোচন করা সম্ভব নয়। এজন্য দরকার সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের কৌশল ও পদ্ধতিতে দক্ষতা অর্জন করা। এ কারণে মনস্থির করেই বিলাতে ধ্বনিবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং বিষয়টি পড়তে এসে তিনি এই ধারণার সত্যতাও খুজে পান। মুসা (১৯৯৮) আবদুল হাইয়ের এই আধুনিক চিন্তাচেতনার পরিচয়টি দিয়েছেন এভাবে, "মুহম্মদ আবদুল হাই, ধ্বনিতত্ত্ব পড়তে গিয়েই উপলব্ধি করেন পূর্বসূরীরা অসচেতন

ঐতিহ্যানুসরণের বিপদে পতিত হয়েছেন। কোন সমাজের ভাষার সবটুকুন ইতিহাসে অবস্থান করে না; কিছুটা ইতিহাসে অবস্থান করে কিন্তু বাকী সবটাই থাকে সমকালীন কথকের মুখে মুখে” (পৃ. ৩৯)।

১৯৫০ সালে বিলাতে সোয়াসে (School of Oriental and African Studies, SOAS) ধ্বনিবিজ্ঞানে উচ্চতর অধ্যয়ন করতে গিয়ে তিনি অধ্যাপক ফার্থের তত্ত্বাবধানে সাংগঠনিক ধ্বনিবিজ্ঞানে গবেষণার সুযোগ লাভ করেন এবং দুই বছর পড়াশোনা শেষে *A Phonetic and Phonological Study of Nasals and Nasalisation in Bengali* শিরোনামে থিসিস বা অভিসন্দর্ভ রচনা করেন। এই অভিসন্দর্ভে প্রমিত বাংলার নাসিক্য ও আনুনাসিক ধ্বনির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে আবদুল হাই সাংগঠনিক রীতি ও পদ্ধতির সন্নিবেশ ঘটান। এরই অংশ হিসেবে তিনি প্যালেটোগ্রাম এবং কাইমোগ্রাম নামক যন্ত্রের সাহায্যে এসব ধ্বনির উচ্চারণ-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এর প্রামাণিকতাকে অনেক বেশি সংহত ও পরিপূর্ণ রূপ দেন। প্রশ্ন হতে পারে, আবদুল হাই বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের অজস্র সাংগঠনিক রূপের মধ্যে শুধু নাসিক্য ও আনুনাসিক ধ্বনিকেই বেছে নিলেন কেন? এর উত্তর তিনি তার অভিসন্দর্ভের ভূমিকাতেই লিপিবদ্ধ করেছেন। আসলে তাঁর তত্ত্বাবধায়ক ফার্থ উপলব্ধি করেছিলেন যে, সংস্কৃতভুক্ত ভাষাসমূহের নাসিক্য ও আনুনাসিক ধ্বনির অভ্যন্তর সংগঠনে লুকিয়ে আছে ধ্বনিতাত্ত্বিক ও ধ্বনিগত কিছু মৌলিক প্রশ্ন যার ভেতরগত রূপ অন্বেষণ করা জরুরি। বিশেষ করে, বাংলা ভাষার বিশেষ্য এবং ক্রিয়ার মধ্যে যে প্রোসোডিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো একে অন্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আর এই ভিন্নধর্মী প্রোসোডিক বৈশিষ্ট্য উন্মোচনের মাধ্যমেই এই ভাষার এ দুটি বর্গের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ সম্ভব। সে কারণে ফার্থের নির্দেশনায় আবদুল হাই তাঁর অভিসন্দর্ভে ধ্বনি বিশ্লেষণে ইউরোপীয় সাংগঠনিক পদ্ধতি, বিশেষ করে ফার্থীয় প্রোসোডিক পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রথম পর্যায়ে বাংলা বিশেষ্য এবং ক্রিয়ার আক্ষরিক সংগঠন নির্দেশ করেন। তারপর এই আক্ষরিক সংগঠনের ওপর ভিত্তি করে তিনি চার ধরনের ব্যঞ্জন থেকে নাসিক্য এবং আনুনাসিক স্বরধ্বনিগুলো শনাক্ত করেন (ইসলাম ১৪০১)।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর এই অভিসন্দর্ভে বাংলা ভাষার নাসিক্য এবং আনুনাসিক ধ্বনির ইউরোপীয় ধারার যে সাংগঠনিক রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করেন তা মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের ধারা থেকে গুণগতভাবে পৃথক ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই বিষয়টি অধ্যাপক ইসলামের (১৪০১) বর্ণনা মতে উপস্থাপন করা যেতে পারে। অধ্যাপক ইসলাম এ বিষয়ে বলেন, মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানী বিশেষ করে ব্লুমফিল্ড ও তাঁর অনুসারীরা একটি ভাষার কাঠামো বিশ্লেষণে যেখানে এর ধ্বনি, ব্যাকরণ এবং বাক্যকে আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করেন, ইয়োরোপের সাংগঠনিক রীতি-পদ্ধতিতে সেখানে ধ্বনি ও ব্যাকরণ সংগঠনকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা হয় না। সে কারণেই আবদুল হাইয়ের অভিসন্দর্ভের প্রোসোডিক ধারার বিশ্লেষণে তা প্রতিফলিত হয়েছে।

অধ্যাপক মুসার বরাতে (১৯৯৮) জানা যায়, মুহম্মদ আবদুল হাই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের

সোয়াস থেকে ধ্বনিবিজ্ঞান বা ধ্বনিতত্ত্বে ডিস্টিংসনসহ এমএ সম্পন্ন করে ১৯৫৩ সনে দেশে ফিরে আসেন এবং পুনরায় বাংলা বিভাগে যোগদান করেন। তারপর থেকেই বাংলা ভাষার ধ্বনিসমূহের সংগঠন বিশ্লেষণের পাশাপাশি বিষয়টিকে বিভাগের শিক্ষার্থীদের কাছে পরিচিতি করে তোলার জন্য তিনি বিভিন্ন বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ রচনা করেন যেগুলো পর্যায়ক্রমে *সাহিত্য পত্রিকায়* প্রকাশিত হতে শুরু করে। পরবর্তীকালে দশটি প্রবন্ধকে একত্র করে তিনি বাংলা *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব* (১৯৬৪) শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এই বইটিকে তার এমএ অভিসন্দর্ভের একটি সফল উপজাত হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ধ্বনিবিজ্ঞানের সাধারণ আলোচনাসহ বাংলা স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি, অর্ধস্বর, দ্বিস্বরধ্বনি, সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি, বাংলা শব্দ ও অক্ষর ভাগ, বাংলা বাক-প্রবাহ, ধ্বনিগুণ, ধ্বনি তরঙ্গ ইত্যাদি ব্যাপক বিষয়ে তিনি এতে বিজ্ঞাননিষ্ঠ সাংগঠনিক বর্ণনা প্রদান করেছেন।

ধ্বনিবিজ্ঞান এবং বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব বইয়ের ভূমিকায় এ সম্পর্কে আবদুল হাই নিজেই মূল্যায়ন করেছেন এভাবে, "বাংলা-ভাষায় ধ্বনিতত্ত্ব-বিষয়ক যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে সুশৃঙ্খল আলোচনার এটিই বোধ হয় প্রথম প্রয়াস" (১৯৬৪: ৫)। ফলে প্রকাশের পর থেকেই বইটি শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী, সমালোচক সবারই ব্যাপক প্রশংসা ও স্তুতিতে ভাসতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ, প্রকৃত ভাষাবিজ্ঞানী না হলেও সৈয়দ আলী আহসান (২০০০)-এর উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি এ সম্পর্কে বলেন, "আবদুল হাই-এর প্রধান কীর্তি বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ। বাংলা ভাষায় এটাই প্রামাণ্য গ্রন্থ। ধ্বনিগত ব্যাকরণ এবং এর প্রতিটি ধ্বনির অন্তর্লীন সত্তার উদঘাটন নানাবিধ চিত্ররূপের মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন। এই সম্পূর্ণ প্রকাশটি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে হয়েছে" (২০০০: ৮৬)। খান (২০০০: ১১২) এই বই সম্পর্কে বলেন, 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' - পাশ্চাত্য বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার এমন বিশদ ও বর্ণনাত্মক আলোচনা আর কেউ ইতঃপূর্বে করেননি"। বসু এই বই বিষয়ে আরও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, "তার ধ্বনিবিজ্ঞান আমাদের ভাষায় অভূতপূর্ব গ্রন্থ, আমার মনে হয় না আগামী পঞ্চাশ বছরেও আবদুল হাই-এর এই গ্রন্থ কোন ক্রমেও ভ্রান্ত প্রমাণিত হওয়ার আশঙ্কা আছে"(১৯৬৯: ৫১৬)। বাংলা ভাষায় ধ্বনিবিজ্ঞানে এই গ্রন্থের অবদান বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানী আজাদের মতও প্রায় অভিন্ন। তাঁর মতে, আবদুল হাই "বাঙলা ধ্বনিবিজ্ঞানকে যেখানে রেখে গিয়েছিলেন আজো সেখানেই নিশ্চল হয়ে আছে; তার বিকাশের কোন আভাস দেখা যাচ্ছে না" (১৯৯৪: [ছয়])। সবমিলিয়ে বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোচনা ও বিশ্লেষণে আবদুল হাইয়ের আধুনিক সাংগঠনিক ধারার প্রবর্তন ও এ বিষয়ে ঈর্ষণীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের কারণেই অধ্যাপক আজাদ তাকে "বাঙলাদেশে আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞান বা ভাষাবিজ্ঞানের জনক" হিসেবে অবহিত করেছেন। মুসাও একই অভিমত প্রকাশ করে বলেন, "ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের সরল বিস্তারিত বর্ণনার অন্তরালে শৃঙ্খলার উপস্থিতি সবাইকে মুগ্ধ করে" (১৯৯৮: ৪১)।

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব* গ্রন্থ বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানী এবং

সমালোচকদের বিভিন্ন সময়ে প্রযুক্ত উল্লিখিত প্রণিধানযোগ্য মতামতের আলোকে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে একবার পরখ করে নেয়া যাক। বাংলা ধ্বনির স্বর, অর্ধস্বর, দ্বিস্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণস্থানের যথাযথ বর্ণনা প্রদান এই গ্রন্থের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান। অর্থাৎ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির উচ্চারণস্থান এমন সংহত ও সঠিকভাবে তিনি নির্ধারণ করেছেন যে এর অতিরিক্ত কোন বর্ণনা আর প্রদান করা আপাতত সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, লেখক প্রথাগত তালব্য ধ্বনির দুটি সংহত উচ্চারণ স্থান নির্দিষ্ট করেছেন যা প্রকৃত অর্থেই যান্ত্রিকভাবেও প্রমাণসিদ্ধ। এগুলো হল —

১. প্রশস্ত দন্তমূলীয় (dorso alveolar) : 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ'

২. পশ্চাৎ দন্তমূলীয় (post alveolar) : 'শ'

একইভাবে তিনি আরও কিছু ব্যঞ্জনের উচ্চারণ স্থান নির্ধারণেও অনুরূপ সংহতি ও যথার্থ দেখিয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন বাংলা ধ্বনির বাক-প্রতঙ্গগত উচ্চারণ কৌশলের যে প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করেছেন তা নিঃসন্দেহে যুক্তিযুক্ত, বস্তুনিষ্ঠ এবং বৈজ্ঞানিক রীতিপদ্ধতি দ্বারা পরিপূর্ণভাবে সমর্থিত। উদাহরণ হিসেবে আবদুল হাই বাংলা স্পর্শ ব্যঞ্জন ধ্বনির যে সরল এবং সকলের জন্য বোধগম্য করে উচ্চারণ কৌশলের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিংসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ ও স্পষ্টতানির্দেশক। তিনি বলেন,

> স্পর্শধ্বনির উচ্চারণের সময় ফুসফুস-আগত বাতাস উচ্চারক দুটির পেছনে এসে জমা হয় এবং উচ্চারক দুটি আলগা হওয়ার সময় ফট্কার মত ধ্বনি করে বাতাস বের হয়ে যায় - স্বল্পপ্রাণ এবং মহাপ্রাণ দুরকম স্পর্শধ্বনির বেলাতেই এ রকমটি হয়। কিন্তু মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনির উচ্চারণের সময় ফুসফুস-চালিত বাতাসের বেগ হয় বেশি, ফলে উচ্চারক দুটির উচ্চারণের স্থান থেকে আল্‌গা হওয়ার সময় ফট্কার মত আওয়াজটিও হয় দ্বিগুণ জোরে। (হাই ২০১৩: ৪৬)

এছাড়াও বাংলা তিনটি নাসিক্য ধ্বনির উচ্চারণ কৌশলের বর্ণনা এবং সেই সঙ্গে আলজিহ্বার সক্রিয়ার কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। আবদুল হাইয়ের আগে তা এত সুনিপুণ দক্ষতা সহযোগে কেউ উপস্থাপন করতে সক্ষম হননি।

পাশাপাশি এই গ্রন্থের ধ্বনি বিশ্লেষণে লেখক আবদুল হাই একটি সমগ্রতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করেছেন যাতে করে পাঠক বাংলা ধ্বনি বিষয়ে একটি সার্বিক চিত্র লাভ করতে সক্ষম হয়। বিষয়টিকে ঘুরিয়ে বললে এভাবে বলা যায় যে, এতে ধ্বনির কাঠামোগত পরিচয় প্রদান ছাড়াও লেখক ধ্বনিগুলোর ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সংকেত, উচ্চারণস্থান নির্দেশের ক্ষেত্রে এর যান্ত্রিক প্রমাণ, ঔপভাষিক রূপ এবং এর সাহিত্যিক রূপের বর্ণনা ও উদাহরণ প্রদান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির মহাপ্রাণতাগুণ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে আবদুল হাই উল্লেখ করছেন যে, ঐতিহাসিক কারণে তা ঘটছে। কেননা ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির যে মহাপ্রাণতা বৈশিষ্ট্য ছিল তা আজো বৈদিক আর্য তথা সংস্কৃতের মাধ্যমে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অক্ষুণ্ন আছে।

ব্যঞ্জনধ্বনির আলোচনায় প্রত্যেকটি ধ্বনির উচ্চারণ স্থান ও রীতিভিত্তিক যে স্বাতন্ত্র্য ও

ভিন্নতর পরিচয়কে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন আবদুল হাই তাঁর এই গ্রন্থে, তা সত্যিই অনন্য যা তার আগে প্রকাশিত ভাষাবিজ্ঞানের কোন গ্রন্থেই দেখা যায়নি। এমনকি এই গ্রন্থের পরবর্তী পর্যায়ে প্রকাশিত গ্রন্থেও তা আর দৃষ্টিগোচর হয়নি। বাংলা ভাষী সাধারণ মানুষের কাছে ধ্বনি ও বর্ণের পার্থক্য তত সহজগ্রাহ্য নয়। ফলে বর্ণমালায় লিপিবদ্ধ কোন কোন বর্ণের ধ্বনিরূপ বা উচ্চারণ নেই তা অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। এ জন্য এক্ষেত্রে অনেকেই সঠিক উত্তরও প্রদান করতে সমর্থ হন না। এই বিষয়টি আবদুল হাই এই গ্রন্থে সুচারুরূপে তুলে ধরেছেন। উদাহরণস্বরূপ, বাংলা বর্ণমালায় 'ঞ এবং 'ণ' থাকলেও এগুলো কেন স্বতন্ত্র ধ্বনি রূপে পরিচিত হতে পারে না তার ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করেছেন। কেননা, 'মিঞা', 'বঞ্চনা', 'লাঞ্ছনা', 'ব্যঞ্জন' ইত্যাদি শব্দে বর্ণ হিসেবে 'ঞ'-এর অস্তিত্ব থাকলেও উচ্চারণ নেই। এছাড়া আবদুল হাইয়ের মতে, বাংলা ভাষায় 'ঙ' এবং 'ং' এর উচ্চারণ পার্থক্যও নেই। এ প্রসঙ্গে যুক্তি সহকারে তিনি আরও উপস্থাপন করেন যে, বাংলার মত আধুনিক গুজরাটি এবং হিন্দিতেও অনুস্বারের স্বতন্ত্র উচ্চারণ নেই। এতে করে 'ঞ', 'ং' ইত্যাদি বর্ণের উচ্চারণহীনতা বিষয়ে একটি উপমহাদেশীয় রূপ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

আমরা জানি, প্রতিটি ভাষাতেই বিভিন্ন মূলধ্বনির অনেক উচ্চারণগত বৈচিত্র্য আছে যা মূলত শব্দে অবস্থানগত কারণে পার্শ্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে হয়ে থাকে। মূলধ্বনির এই উচ্চারণগত বৈচিত্র্যকে সহ-ধ্বনিমূল নামে অভিহিত করা হয়। বাংলা ভাষায় বেশ কিছু মূলধ্বনির সহ-ধ্বনিমূল আছে যেগুলো আবার বাংলা বর্ণমালায় বর্ণগত রূপ পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মূর্ধন্য-'ণ' বর্ণের কথা এখানে আনা যেতে পারে। ধ্বনিবিজ্ঞানী আবদুল হাই উচ্চারণস্থানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন শব্দগত দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন, কেন এটি বর্তমানে দন্তমূলীয় 'ন' এর সদস্য বা সহ-ধ্বনিমূলে পরিণত হয়েছে। একইভাবে বাংলা বর্ণমালাতে তিনটি 'শ'-ধ্বনির মধ্যে একমাত্র 'শ'টিই কেন মূলধ্বনি বা ধ্বনিমূল হয়েছে এবং 'স' টি কোন কারণে সহ ধ্বনিমূলে পরিণত হয়েছে তার কারণ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

ধ্বনির আলোচনায় হরফ বা বর্ণের প্রসঙ্গটি অনেক ধ্বনিবিজ্ঞানী প্রয়োজনীয় মনে করেন না। কেননা ধ্বনির লিখিত রূপ বর্ণ হলেও বর্ণমালায় এমন কিছু বর্ণের অস্তিত্ব আছে যেগুলোর নির্ধারিত উচ্চারণ নেই। সে কারণে ধ্বনিবিজ্ঞান বা ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় বর্ণ বা হরফ অনেকটাই অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু এক্ষেত্রে আবদুল হাই ব্যতিক্রম। তিনি প্রতিটি বাংলা স্বর এবং ব্যঞ্জনধ্বনি আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে সংশ্লিষ্ট বর্ণের ধ্বনি সংশ্লিষ্টতা নিয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষ করে, এক্ষেত্রে এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলা সংযুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ খুবই প্রাসঙ্গিক এবং যুক্তিপূর্ণ। এতে একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় সংশ্লিষ্ট ভাষার লিখনরীতির যুক্ততা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কেননা লিখিত ভাষার উচ্চারণরীতির সাথে এর লিখনরীতির সমাপতন (overlapping) ঘটেছে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ এই দুই ভাবেই। এ প্রসঙ্গে আবদুল হাই নিজেই বলেছেন "...ধ্বনি বিশেষকে রঙে রেখায় চিহ্নিত করার জন্যই বর্ণের সৃষ্টি" (২০১৩: ৭৬)।

শিরোনাম দেখেই বুঝা যায়, আবদুল হাইয়ের *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব* বইটি আলোচ্যসূচির প্রকৃতি অনুযায়ী দুই ভাগে বিভক্ত। এর প্রথম অংশ বা ধ্বনিবিজ্ঞান অংশে লেখক phonetics বা ধ্বনিবিজ্ঞানের প্রাথমিক বর্ণনা প্রদান করেছেন। পাশাপাশি এই বর্ণনা অংশের উদাহরণ হিসেবে তিনি বিভিন্ন বাংলা স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি, দ্বিস্বরধ্বনি, অর্ধস্বর ইত্যাদির প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। অন্যদিকে এর দ্বিতীয় অংশে phonology বা ধ্বনিতত্ত্বের বর্ণনারীতির আলোকে তিনি বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমূহের পরিবর্তন প্রক্রিয়া, ধ্বনি প্রবাহের বৈশিষ্ট্যসমূহ, বাংলা বর্ণমালায় উল্লেখিত সরল বর্ণ এবং বর্ণমালা বহির্ভূত বিভিন্ন ধরনের যুক্তবর্ণের সাথে এসব ধ্বনির মিথস্ক্রিয়া ও আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপ, বাংলা লিপি ও বানান সমস্যাদি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এসব উপাদানের ভেতরগত সংগঠনের রূপ ও স্বরূপকে তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশের বর্ণনা এত বেশি গভীরতাসূচক এবং প্রাজ্ঞতামণ্ডিত যে তা ব্যাপক বিশ্লেষণের দাবি রাখে যা এই প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব নয়। সব মিলিয়ে বলা যায় যে, *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব* গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার কারণে এটি দুটি পৃথক বই হিসেবে প্রকাশের দাবি রাখে।

আবদুল হাই তাঁর এই গ্রন্থে মানুষের উচ্চারিত ধ্বনি এবং ব্যবহৃত শব্দের অর্থ পার্থক্যের স্বরূপটি বুঝানোর জন্য বাস্তব জীবন থেকে দৃষ্টান্ত টেনে এনেছেন যাতে পাঠক সহজেই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মুখের ভাষার প্রতিটি ধ্বনির আলাদা অস্তিত্ব এবং শব্দের আলাদা অর্থের বিষয়ের সঙ্গে শহরের ট্রাফিক বাতির প্রসঙ্গটির অবতারণা করেছেন। একইভাবে দ্বিত্ব ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণের ক্ষেত্রে উচ্চারকদ্বয়ের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য যে স্থিতাবস্থা তৈরি হয় তাকে যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধরত দুজন সৈনিকের কিছুক্ষণের জন্য "প্যাচমারা অবস্থার" সঙ্গে তুলনা করেছেন। এইভাবে ধ্বনিবিজ্ঞানের মত আপাত রসকষহীন একটি বিজ্ঞানের বর্ণনাকে পাঠকের কাছে সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জল করে তোলার ক্ষেত্রে বাস্তবজীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করার বিষয়টি নিঃসন্দেহে একজন দক্ষ বিজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব হয় যা মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব* গ্রন্থে ব্যাপকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ধ্বনিবিজ্ঞানের সূত্র অবলম্বনে বাংলা ধ্বনিসমূহের ব্যাখ্যা ও এর প্রগাঢ় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর এই মুন্সিয়ানা এবং পাণ্ডিত্যের জন্যই অধ্যাপক আজাদের মত প্রশংসা-কার্পণ্য মানুষও আবদুল হাইকে বাংলা ধ্বনিতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে 'আচার্য' রূপে অভিহিত করেছেন।

ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব বইটি গভীরভাবে পাঠ করলে বেশ কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাও দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথমেই বলতে হয় বর্ণনার ক্ষেত্রে এর পুনরুক্তিদোষের কথা। বিশেষ করে, ধ্বনির উচ্চারণস্থান বা রীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অধ্যায়ে বারবার একই ধরনের বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া যায়। অধ্যাপক মুসা (১৯৯৮) তার এ ধরনের পুনরুক্তিদোষের একটি যৌক্তিক কারণ প্রদানের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন এই বইটি আবদুল হাই যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কথা মনে রেখে একটি পাঠ্যবই হিসেবে রচনা করেছেন সেহেতু বর্ণনার ব্যাপকতার জন্যই এই পুনরুক্তিদোষ ঘটেছে। যদি শুধু পণ্ডিতদের কথা মাথায় রেখে লিখতেন, তাতে হয়তো এড়ানোর চেষ্টা করা যেতে পারতো। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই গ্রন্থটি বর্তমানে

বাংলাভাষী অঞ্চলে শিক্ষার্থী, শিক্ষানবিশ, গবেষক, অধ্যাপক, পণ্ডিত সকলের কাছেই সমাদৃত একটি অতিনির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে মনে হয়, লেখক নিজে যদি গভীর অভিনিবেশ সহযোগে সম্পাদনার কাজটি করতেন তাহলে হয়তো এই পুনরুক্তিদোষ এড়ানো যেত। এই বইয়ের বর্ণনায় কোন কোন ক্ষেত্রে কোড-মিশ্রণের ঘটনা ঘটেছে। হয়তো তা বিষয়গত কারণেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণনায় ক-বর্গীয় ধ্বনির কণ্ঠ্যজাত উচ্চারণের প্রাসঙ্গিকতার কথা বলতে গিয়ে তিনি যে আরবি ধ্বনির সাথে মিলে যায় সে আরবি ধ্বনিকে সেমেটিক লিপিতে উপস্থাপন করেছেন। এতে করে বাঙালি পাঠক যারা আরবি লিপির সাথে পরিচিত নন, তা পাঠ করতে গিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পঠনবৈকল্যে আক্রান্ত হতে পারেন। এছাড়া বাংলা ওষ্ঠ্য ধ্বনি 'ফ' এবং 'ভ' এর উচ্চারণস্থানের কথা বলতে গিয়ে এক জায়গায় এগুলোকে স্পষ্ট 'ওষ্ঠ্য' ধ্বনি বললেও অন্যক্ষেত্রে 'দ্বিওষ্ঠ্য' হিসেবে গণ্য করেছেন।

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা* (১৯৫৯)। এই গ্রন্থের নামকরণ দেখে তাৎক্ষণিকভাবে মনে হতে পারে যে, এটি সমাজভাষাবিজ্ঞানের একটি বই যেখানে লেখক বাংলাভাষী অঞ্চলের রাজনৈতিক বুলির সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তৎপর হয়েছেন। কিন্তু এই নামটি অনেকটাই বিভ্রান্তিকর। অধ্যাপক আজাদ (১৯৯৪) এই বইয়ের নামকে চমৎকার বললেও এই 'বিভ্রান্তিকর' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। কারণ এই গ্রন্থে যে ২৪টি অধ্যায় রয়েছে, তার মধ্যে ১৭টির বিষয়বস্তু অন্তত ভাষা নয়। বরং সমকালের ঘটনাপ্রবাহ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ ইত্যাদি কখনও রম্য আকারে আবার কখনও গল্পের পটভূমিতে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে "ওস্তাদজী" এবং "শিলংএ মে মাস"-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই অধ্যায়গুলির বর্ণনাভঙ্গি এবং কৃতকৌশলের প্রকৃতি দেখে আজাদ এই রচনাগুলিতে যে প্রমথ চৌধুরী এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাব রয়েছে তা উল্লেখ করেছেন। বাকি ৭টি প্রবন্ধ মোটা দাগে ভাষা ও ভাষার সাথে সমাজভাবনা বিষয়ক। বিশেষ করে, ভাষার কথা, কথা শেখা, ধ্বনির ব্যবহার, ভাষা ও ব্যক্তিত্ব এই চারটি প্রবন্ধে আবদুল হাই মানুষের জীবনে ভাষিক ধ্বনির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ও তার ব্যক্তিত্ব গঠনে যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক এবং পেশাগত জীবনে সফলতার যে গুরুত্ব রয়েছে, তা যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি কি কি কারণে মানুষের বাচন বৈকল্য বা ভাষাবৈকল্য দেখা দিতে পারে তাও বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের সমস্যা সমাধানে বাচন থেরাপি কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে আবদুল হাই তাও উল্লেখ করেছেন এভাবে, "ধ্বনিবিজ্ঞানের এই speech therapy বিভাগ দুনিয়ার অসংখ্য ভাগ্যহীনকে নানা দুঃখ ও লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ধ্বনি বিজ্ঞান কি ভাবে এ রোগ মুক্তির কাজে লাগছে, কিছুদিন আগে লন্ডনে 'Mundy' বলে তাঁর একটি ছবি দেখলাম" (কথা শেখা: ২৮৫)।

আবদুল হাইয়ের এই উক্তি ভাষাচিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর দূরদর্শিতাকেই ইঙ্গিত করে। যোগাযোগ বৈকল্য বা বাচন ও ভাষা থেরাপি আজকের বাস্তবতায় পশ্চিমে একটি

অপরিহার্য বিষয় হলেও পঞ্চাশের দশকে বাংলাভাষী অঞ্চলে তা ছিল এক অতি উচ্চাভিলাষী চিন্তা। কিন্তু আচার্য ভাষাবিজ্ঞানী বাংলাদেশের বাস্তবতায় তা যে অপরিহার্য বিবেচিত হবে তাও আগাম বলে গিয়েছেন। বাংলাদেশে উত্তরকালের ভাষাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্টরা তাঁর এই দূরদর্শিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ২০১৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'যোগাযোগ বৈকল্য' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, বাংলাদেশে ভাষাবিজ্ঞান তাঁরই নিদেশির্ত পথ ধরেই অগ্রসরমান।

তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা গ্রন্থের শেষ দুটি প্রবন্ধ তার নামের প্রতি সুবিচার করেছে। কেননা এই দুটির বিষয়বস্তু গ্রন্থের নামকরণের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াবলি কিভাবে মানুষের ভাষাভাবনাকে প্রভাবিত করেছে তারই প্রতিফলন দেখা যায়। বিশেষ করে "তোষামোদের ভাষা" প্রবন্ধে আবদুল হাই আমাদের সমাজে তোষামোদের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য কিরকম তা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন, যদিও শেষ দিকে তিনি এ প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের মধ্য ও আধুনিক যুগের কিছু উৎকৃষ্ট বর্ণনায় তোষামোদ বা প্রশংসা কিভাবে প্রকীর্তিত হয়েছে তার উদাহরণ প্রদান করেছেন। সবশেষে "রাজনীতির ভাষা" প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, ভাষা একটি রাজনৈতিক প্রপঞ্চ হিসেবে মানুষের রাজনৈতিক চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তিনি সেই সাথে এটিও নির্দেশ করেছেন যে, এ কারণেই যুগে যুগে রাজনৈতিক শক্তিগুলো জনগণের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণের জন্যে নির্মাণ করেছে রাজনৈতিক শব্দাবলি এবং তা প্রচলনেও হয়েছে অতিশয় তৎপর।

ছাত্রবোধ্য ব্যাকরণ-গ্রন্থ লেখার ক্ষেত্রে শিক্ষক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের বিশেষ প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এই ধারা অবশ্য তাঁর শিক্ষক মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মধ্যেও ছিল। সেই প্রেরণাতেই তিনি *প্রাথমিক বাংলা ব্যাকরণ* (প্রকাশ সন উল্লেখ নেই) শীর্ষক এক বই রচনা করেছেন। এই বইটির উল্লিখিত শিরোনামের কারণে প্রথাগত ধারার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হলেও প্রকৃত অর্থেই সাংগঠনিক রীতি ও পদ্ধতি অনুসারে লিখিত প্রথম ছাত্রবোধ্য বাংলা ব্যাকরণ, যদিও বিভিন্ন অধ্যায়ের পরিভাষাগুলোতে প্রথাগত নামের ছাপটি রয়ে গেছে। অর্থাৎ এর কাঠামোটি প্রথাগত হলেও বিভিন্ন অধ্যায়ের বিশ্লেষণ পদ্ধতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে আধুনিক সাংগঠনিক ধারার বর্ণনাকৌশল। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এখানে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় পাঠ বর্ণ প্রকরণে তিনি বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জনের যে বর্ণনা করেছেন তা আধুনিক সাংগঠনিক ধারাপ্রসূত। সেই কারণেই তিনি 'ঋ'-কে বাংলা স্বরবর্ণ বলতে চাননি। এছাড়া এ তথ্যও আমাদের প্রদান করছেন যে, বাংলা হ্রস্বস্বর এবং দীর্ঘস্বরের অস্তিত্ব থাকলেও উচ্চারণের সময়ের দিক থেকে কোন হ্রস্বতা বা দীর্ঘতা নেই। 'য', 'র', 'ল', 'ব' এই বর্ণগুলিকে কেন অন্তঃস্থ বর্ণ বলা হয় তার সংজ্ঞাও প্রদান করেছেন যা পাঠক মাত্রের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং উপকারী বলে বিবেচিত হবে। অষ্টম পাঠের অনুসর্গ অধ্যায়ে লেখক বাংলা অনুসর্গ এবং বিভিন্ন কারক বিভক্তি একসাথে আলোচনা করেছেন যা একেবারেই সাংগঠনিক ভাষবিজ্ঞানের রীতি ও পদ্ধতি দ্বারা সমর্থিত। তাছাড়া এই বইয়ের ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বাংলা উপভাষা থেকে নানাভাবে উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিও যৌক্তিকভাবে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানপ্রসূত।

আবদুল হাইয়ের *প্রাথমিক বাংলা ব্যাকরণ*-এর বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচনায় কিছু অনন্যতা এবং এরই সাথে সম্পর্কিত কিছু নতুন বর্ণনাভঙ্গিও চোখে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় পাঠের বর্ণ প্রকরণের আলোচনায় ধ্বনির বর্ণনারীতি ও বিশ্লেষণ কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। তৃতীয় পাঠে বর্ণিত পদ প্রকরণে তিনি শব্দ ও পদের পার্থক্য সুন্দর উদাহরণ সহযোগে উপস্থাপন করেছেন। তবে এক্ষেত্রে তার প্রদত্ত শব্দের সংজ্ঞাটি অনন্য, "মানুষের মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনিকে শব্দ বলে"। অনন্য বলছি এ কারণে যে, আমরা এতদিন জানতাম যে ধ্বনি মাত্রই অর্থহীন। নবম পাঠের ক্রিয়ার বর্ণনায় বলা হয়েছে, "ক্রিয়া ভাষার প্রাণ"। কিন্তু বাংলা বাক্যের গাঠনিক বৈশিষ্ট্য এমনই যে, প্রত্যক্ষ ক্রিয়া ছাড়াও বাক্য তৈরিতে কোন সমস্যা নেই; বা ক্রিয়াহীন বাক্যও ভাষীর কাছে সমানভাবে অর্থপূর্ণ। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, লেখকের উল্লিখিত বাক্যটি প্রকৃত অর্থে অর্ধসত্য একটি উক্তি। এসব কতিপয় সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আবদুল হাইয়ের *প্রাথমিক বাংলা ব্যাকরণ* বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক উপাদানের সাংগঠনিক বিশ্লেষণে একটি সফল ও কার্যকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

এই বই রচনার মাধ্যমে মুহম্মদ আবদুল হাই যা চেয়েছিলেন তার মমার্থ হচ্ছে, বাংলা ভাষার প্রাথমিক ব্যাকরণ পড়ার ক্ষেত্রে এখন থেকে আমাদেরকে প্রথাগত ধারার ঐতিহ্যানুসারী সংজ্ঞার বদলেও সাংগঠনিক ধারার আধুনিক বিষয়সমূহ পাঠ করা উচিত যাতে ব্যাকরণশিক্ষার কৌশল ও পদ্ধতিটি অনেক বেশি যৌক্তিক এবং গ্রহণযোগ্যতা পায়। সে কারণে বর্তমানে বাজারে প্রচলিত অসংখ্য এলোমেলো ও হাতুড়ে ব্যাকরণ বইয়ের পরিবর্তে এই বইটি প্রাথমিক স্তরে একটি আবশ্যিক ব্যাকরণ গ্রন্থ হিসেবে চালু করা উচিত। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এ ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এতে করে বাংলাদেশের মেধাবীতম ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের প্রতি জাতি হিসেবে যেমন আমাদের ঋণ শোধ করা হবে, তেমনি আমাদের নবীন শিক্ষার্থীরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাকরণ পাঠ করায় আগ্রহী হবে।

এছাড়াও মুহম্মদ আবদুল হাই ডব্লিউ জে বলের সহযোগিতায় *The Sound Structures of English and Bengali (1961)* শিরোনামে একটি বই লিখেছিলেন। এই বইটি রচনার ক্ষেত্রেও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থী-শিক্ষণ। এর ভূমিকাতে লেখকদ্বয় এই উদ্দেশ্যটি উল্লেখ করছেন এভাবে যে, এই বইটি ভাষাবিজ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তি বা যারা ইংরেজি পরিবেশে থেকে ইংরেজি ভাষা শিখেছেন তাদের জন্য লেখা হয়নি; কিন্তু যেসব বাঙালি শিক্ষার্থী গভীরভাবে পরিশ্রমসিদ্ধ উপায়ে ইংরেজি শিখতে আগ্রহী তাদের জন্য রচিত হয়েছে। সে কারণে তারা প্রতিটি অধ্যায়েই ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণিক উপাদানের তুলনামূলক বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন যাতে পাঠক বাংলার সাথে সংশ্লিষ্ট ইংরেজি ব্যাকরণের উপাদানসমূহ তুলনা করে তা শিখে নিতে পারে।

পরিশেষে, এটা বলা অসংগত নয় যে, বাংলাভাষী অঞ্চলের ঐতিহাসিক ধারার

ব্যাকরণচর্চার আবহে মুহম্মদ আবদুল হাই-ই প্রথম আধুনিক ধারার বর্ণনামূলক ব্যাকরণের প্রাণপ্রবাহ নিয়ে আসেন এবং তৈরি করেন এমন একটি প্রাণবান একাডেমিক পরিমণ্ডল যার কল্যাণে বাংলাদেশ নামক এই বদ্বীপে ভাষাবিজ্ঞানের এক ধারাবাহিক অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। তাঁরই নির্দেশিত পথ ধরেই এই অঞ্চলের ভাষাবিজ্ঞানের গতিপথ নির্ধারিত হয়েছে এবং এই পথরেখা অবলম্বন করেই ভাষাবিজ্ঞানচর্চা এই অঞ্চলে সম্প্রসারিত হবে এবং গতিময়তা লাভ করবে তা নিংসন্দেহে বলা যায় । ধ্বনিবিজ্ঞানের 'আচার্য' এবং বাংলাদেশে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের জনক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের প্রতি রইল আমাদের সতত প্রণতি।

অন্ত্যটীকা

১. এই প্রবন্ধটি ২৪ শে নভেম্বর, ২০২২ তারিখে বাংলা একাডেমিতে 'একক বক্তব্য' হিসেবে পঠিত হয়েছিল।

তথ্যনির্দেশ

আজাদ, হুমায়ুন (১৪০০)। আচার্য মুহম্মদ আবদুল হাই। *সাহিত্য পত্রিকা*, ৩৭(১), ৯-৩৭।

আজাদ, হুমায়ুন (১৯৯৪) (সম্পা.)। *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী*, (প্রথম - তৃতীয় খণ্ড)। বাংলা একাডেমী: ঢাকা

আজাদ, হুমায়ুন (১৯৯৪)। অবতারণিকা। (সম্পা. হুমায়ুন আজাদ), *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী*, (পাচ- ষোলো)। বাংলা একাডেমী: ঢাকা

আহসান, সৈয়দ আলী (২০০০)। আবদুল হাই স্মরণে। (সম্পা. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান), *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারকগ্রন্থ*, (৮৩-৮৭)। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ: ঢাকা।

ইসলাম, রফিকুল (১৪০১)। ধ্বনিবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই। *সাহিত্য পত্রিকা*, ৩৭(৩), ৯-২৭।

খান, আ (২০০০)। আবদুল হাই স্মরণে। (সম্পা. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান), *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারকগ্রন্থ*, (১০৫-১২৭)। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ: ঢাকা।

বসু, অ (১৯৬৯)। অধ্যাপক আবদুল হাই। *কম্পাস*, ৬(২২), ৫১৬।

মুসা, মনসুর (১৯৯৮)। *মুহম্মদ আবদুল হাই*। বাংলা একাডেমী: ঢাকা।

হাই, মুহম্মদ আবদুল (২০১৩)। *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*। মল্লিক ব্রাদার্স: ঢাকা